রবীন্দ্রনাথ ও ইবন জুবাইর-এর ভ্রমণসাহিত্য : একটি তুলনামূলক আলোচনা

মুহাম্মদ শাযাআত উল্লাহ ফারুকী*

[সারসংক্ষেপ : বাংলা ভ্রমণসাহিত্য ও আরবি ভ্রমণসাহিত্য ভাষাগত দিক থেকে দুটি দুই ভাষার হলেও ভ্রমণের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, শব্দচয়ন, ভ্রমণের এলাকা নির্বাচন প্রভৃতি দিক থেকে দুটি ভ্রমণ সাহিত্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় ভ্রমণসাহিত্য রচনা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। অপরদিকে নবম শতাব্দী থেকেই আরবি 'ভ্রমণসাহিত্যে'র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১ খ্রি.–১৯৪১ খ্রি.)-এর স্বতন্ত্র ধারার রচনা খুবই সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। সৃষ্টির অন্যান্য শাখার মতো এখানেও তিনি কেবল অনন্য নন, এক বিস্ময়। পক্ষান্তরে ভূগোলবিশারদ, পরিব্রাজক, লেখক ও স্পেনীয় আরবি কবি হিসেবে খ্যাত ইবন জুবাইর আল-আন্দালুসী (১১৪৫ খ্রি.–১২১৭ খ্রি.) তাঁর *রিহ্‌লা ইবন জুবাইর* বা 'ইবন জুবাইরের সফরনামা'র মধ্যে নিজের এবং সামসময়িক যুগের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তা সে যুগের অক্ষয় থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ যুগ-মানসেরই প্রতিচ্ছবি। তিনি গোটা জীবনে দশ বছরের অধিক কাল ভ্রমণ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইবন জুবাইরের ভ্রমণসাহিত্যের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করার পাশাপাশি তুলনামূলক সাহিত্যিক সমালোচনার প্রয়াস থাকবে।]

সাহিত্যের ইতিহাসে ভ্রমণসাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর (৯৮২–১০৫৪) জন্মভূমি বিক্রমপুর ছেড়ে তিব্বত হয়ে চীনে যান। তবে তাঁর এই চীন-তীব্বতসংক্রান্ত কোনো লিখিত বিবরণী পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শরচ্চন্দ্র দাশ (১৮৪৯–১৯১৭) জ্ঞানের অন্বেষণে একাধিকবার তিব্বতে গিয়েছেন। এবং তিনি সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে ইংরেজি ভাষায় লেখেন *My Journy to Central Tibet and Lasah* বা *তিব্বত ভ্রমণবৃত্তান্ত* শীর্ষক ভ্রমণকাহিনি। এই লেখাটি বাঙালির মানস ও সাহিত্যকৃতিতে আলোচিত। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষায় ভ্রমণসাহিত্য রচনা শুরু হয়। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের প্রথম সারির কয়েকটি গ্রন্থ হলো শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭–১৯১৯) *ইংল্যান্ডের ডায়েরী*, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪–১৮৮৯) *পালামৌ*, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৩–১৯৪৯) *চীনযাত্রী*, জলধর সেনের (১৮৬০–১৯৩৯) *হিমালয়*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১ খ্রি.–১৯৪১ খ্রি.) *যাত্রী* প্রভৃতি। বাঙালি ভূ-পর্যটক হিসেবে খ্যাতি পাওয়া লেখক হলেন ভারতীয় তরুণ বিমল মুখোপাধ্যায় (মুখার্জি) (১৯০৩–১৯৮৭), যিনি ১৯২৬ সালে সাইকেলে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, উত্তর আফ্রিকা ঘুরেছিলেন এবং ১৯৩৭ সালে ভারত ফিরে আসেন। তাঁর *দু'চাকায় দুনিয়া* দুঃসাহসিক ভ্রমণের বর্ণনা ধারণ করেছে। ভ্রমণসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী স্বতন্ত্র ধারার এবং খুবই সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। সৃষ্টির অন্যান্য শাখার মতো এখানেও তিনি কেবল অনন্য নন, এক বিস্ময়। তাঁর পরেও অনেক লেখকের কল্যাণে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের সমৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। যেমন অন্নদাশংকর রায়ের (১৯০৪–২০০২) *পথে প্রবাসে*, সৈয়দ মুজতবা আলীর (১৯০৬–১৯৭৪) *দেশেবিদেশে*,

* অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবোধকুমার সান্যালের (১৯০৫–১৯৮৩) *মহাস্থানের পথে*, অবদূতের (১৯১০–১৯৭৮) *মরুতীর্থ হিংলাজ* এ ধারাবাহিকতায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। পরবর্তীকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩), নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮), হাসনাত আব্দুল হাই (১৯৩৯) প্রমুখ বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখে চলেছেন (রবীন্দ্রনাথ, ২০১০ : খণ্ড ১, ভূমিকা–১)। একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষায় কতিপয় ভ্রমণ সাহিত্যের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'ভ্রমণ অমনিবাস (১)', মৈত্রেয়ী দেবীর 'অচেনা চীন', বিশ্বনাথ জোয়ারদারের 'অন্য কলকাতা', সমরেশ মজুমদারের 'অন্যরকম ভ্রমণ', চিন্ময় চক্রবর্তীর 'অরণ্যের টানে', শংকরলাল ভট্টাচার্যের 'আথেন, হেলেন ও সেই ক্রন্দশী', মনোজ বসুর 'আফ্রিকান সাফারি', অর্ভিন ঘোষের 'আবার স্বদেশে', শংকরের 'আমাদের চিনচর্চা', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার ইউরোপ ভ্রমণ' এর নাম ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।[১]

অপরদিকে, প্রাচীনকাল থেকে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো আরবগণও ভ্রমণসাহিত্য সম্পর্কে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন যুগে এ সাহিত্যের প্রতি তাঁদের কদর বেশ লক্ষণীয়। সম্ভবত আরবি ভ্রমণসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হলো 'রিহলা আস্-সিরাফী'। এরপর 'রিহলা সালাম আত-তারজুমান' বা সালাম আত-তারজুমানের সফরনামা। অতঃপর ঐতিহাসিক আল-মাস'উদী (৮৯৬–৯৫৭ খ্রি.), মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-মাকদিসী (৯৪৭ খ্রি.–৯৯০ খ্রি.), স্পেনীয় পরিব্রাজক আল-ইদ্রিসী (১১১০–১১৬৬ খ্রি.) এবং ঐতিহাসিক আব্দুল লতীফ আল-বাগদাদীর সফরনামা পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আল-ইদ্রিসী ভ্রমণ সাহিত্যে 'নুয্হাতুল মুশ্তাক ফি ইখতিরাক্বিল আফাক' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তারপর আসে আল-বিরুনীর (মৃত. ১০৪৮ খ্রি.) ভ্রমণ সাহিত্য। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ও তার পরের শতাব্দীগুলোতে ভ্রমণ সাহিত্যের ব্যাপকতা বিশেষ লক্ষণীয়। এর মাঝে স্পেনের ইবন জুবাইরের (১১৪৫ খ্রি.–১২১৪ খ্রি.) সফরনামা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। অতঃপর চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতার (১৩০৪ খ্রি.–১৩৭৭ খ্রি.) আরবি ভাষায় রচিত সফরনামা সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করে। তাঁর ভ্রমণ কাহিনির শিরোনাম হলো, "তুহফাত-উন্-নুয্যার ফী-গরায়েবিল আমছার ওয়া আজায়েবিল আস্ফার" অর্থাৎ অদ্ভূত দেশ-নগর ও আশ্চর্যজনক ভ্রমণকাহিনির বর্ণনা সম্পর্কিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের তোহ্ফা বা উপঢৌকন। সফরকালে তিনি বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব মূল্যবান তথ্যসংগ্রহ করেন তারই প্রতিফলন দেখা যায় 'ইবনে বতুতার সফরনামায়'। কাজী দীন মুহম্মদের মতে– চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে একটা বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করাই ছিল গ্রন্থখানা রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইবনে বতুতার এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে (ইবনে বতুতা, ১৯৬৮ : কাজী দীন মুহম্মদের প্রসংগ কথা)। এই একই শতাব্দীতে আরো একজন মুসলিম পরিব্রাজক গ্রানাডার সাহিত্যিক লিসান-উদ-দীন আল-খতীবের সফরনামার কথা জানা যায়। এঁদের সাথে যুক্ত করতে হয় বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খলদুনের সফরনামার কথা যা অত্যন্ত সরল ভাষায় প্রণীত। তিনি তাঁর সফরনামায় স্পেনের বিভিন্ন নগরীর বর্ণনা দিয়েছেন, বিশেষ করে বানূ আল-আহমার সম্প্রদায়ের গ্রানাডার রাজার অতিথি হিসেবে তাঁর স্পেনে অবস্থানকালীন সময়ের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। এভাবে ধীরে ধীরে এই ভ্রমণ সাহিত্য শৈল্পিক রূপ ধারণ করে সাহিত্য অঙ্গনে এক বিশেষ স্থান করে নেয়। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভ্রমণ সাহিত্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে রিফা'আহ রাফি' আত্-তাহতাভী, আহমদ ফারিস আশ-শাদয়াক, মিসরীয় সাহিত্যিক হোসাইন ফৌজী, তাওফীক আল-হাকীম, আল-বাতাতুনী,

শাকীব আরসালান ও হামদ আল-জাসিরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্মর্তব্য যে, আরবি ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসে কোনো পরিব্রাজিকার নাম এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইবন জুবাইরের পরিচয়

তাঁর নাম– মুহাম্মাদ, উপনাম– আবুল হাসান, পিতার নাম– আহমাদ এবং দাদার নাম– জুবাইর। যিনি ইবন জুবাইর আল-আন্দালুসী হিসেবে পরিচিত।[৪] তিনি প্রসিদ্ধ 'আদনানী মুদার বংশের 'কিনানা' গোত্রের 'বানু দামরাহ্' শাখাগোত্রে ১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মতান্তরে ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ৯ সেপ্টেম্বর শনিবার রাতে স্পেনের ভালেন্সিয়ায়[৫] জন্মগ্রহণ করেন (আল-মাক্বরীযী, ১৯৯১ : ১৫২)। এই রাজ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করে কবি ইবন আয্-যক্কাক (Ibn al-Zaqqaq) আল-বালান্সী কবিতা লিখেছেন।[৬] ধারণা করা হয়, ইবন জুবাইর এমন এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক, যারা খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ সেনাপতি বাল্জের[৭] সাথে প্রাচ্য হতে স্পেনে এসে বসতি গড়েছিল (আত্-তুজায়বী, ১৯৭৫ : ১২৩; লিসানুদ্দীন ইবন আল-খাতীব, ১৯৭৪ : ২৩০)। ভালেন্সিয়ার 'শায়তুভা'[৮] (Xàtiva) শহরের যেখানে তাঁর পিতা চাকরি করতেন সেখানেই তিনি তাঁর পিতা ও আবূ 'আব্দিল্লাহ্ আল-আসীলীসহ সভমসময়িক অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছ থেকে প্রাথমিক জ্ঞান শিক্ষা করেন। পাশাপাশি গণিত, সাহিত্য ও ভাষাজ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল বেশ অনুরাগ। ধীরে ধীরে তাঁর মাঝে গদ্য ও কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। এ প্রতিভাই তাঁকে পরবর্তীকালে লেখক হিসেবে গড়ে তোলে। অতঃপর গ্রানাডার গভর্ণর আল-মুহাদ বংশের (Almohad Dynasty) রাজা আবূ সাঈদ 'উস্মান ইবন আব্দুল মুমিন তাঁকে সচীব পদে চাকরি দিলে গ্রানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পরবর্তীকালে মিশরে গেলে হাফিয আবূ মুহাম্মাদ আল-মুন্যিরী ও আবুল হোসাইন ইয়াহ্য়া ইবন 'আলী আল-ক্বারাশী তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন (আল-মাক্বরীযী, ১৯৯১ : ১৫২)।

ইবন জুবাইরের ভ্রমণ সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট

গভর্নর আবু সাঈদ একদিন মদ্যপ অবস্থায় তাঁর পক্ষ থেকে একটি পুস্তক প্রণয়ন করার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠান। তখন তিনি ইবন জুবাইরকে এক পেয়ালা মদপান করতে দিলে ইবন জুবাইর পাপের ভয়ে তা পান করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন আবূ সাঈদ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে সাত পেয়ালা মদপান করানোর শপথ করেন এবং এক পর্যায়ে সাত পেয়ালা মদপানে তাঁকে বাধ্য করেন। অবশেষে একান্ত বাধ্য হয়ে ইবন জুবাইর সাত পেয়ালা মদপান করলেন। তারপর গভর্ণর আবূ সাঈদ ঐ সাতটি পেয়ালাকে স্বর্ণমুদ্রায় ভর্তি করে তাঁকে ফেরৎ দিলেন। মদপানের এই পাপ মুছার জন্যে তিনি ঐ সকল স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে পবিত্র হজ পালনের সিদ্ধান্ত নেন।

কেউ কেউ মনে করেন, ইবন জুবাইরের সফরনামা মূলত তিনটি ভ্রমণের সমন্বয়ে লিখিত। তাঁর প্রথম ভ্রমণ ছিল মক্কাভিমুখে। তিনি গ্রানাডা থেকে সিউটার উদ্দেশ্যে ১১৮২ সালে যাত্রা শুরু করে সাগর পথে আলেকজান্দ্রিয়ায়, তারপর মক্কার উদ্দেশ্যে 'আইযাব (Aydhab or Aidab) বন্দর হয়ে জিদ্দায় পৌঁছেন। শেষমেষ মক্কায় পৌঁছে হজ করে মদিনা, কুফা, বাগদাদ, মুসেল, আলেপ্পো, ও দামেশক ভ্রমণ করেন। তারপর ১১৮৫ সালে গ্রানাডায় ফিরে আসতে সাগর পথে সিসিলি (Sicily) ভ্রমণ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি গভর্ণর আবূ সাঈদকে ত্যাগ করে যে সফরে বের হন তাতে তিনি টানা দুই বছর বাইরে কাটিয়ে দেন এবং তাঁর অবলোকিত

দৃশ্যাবলির বিবরণ একটি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেন যা পরবর্তীকালে "*রিহলা ইবন জুবাইর*" বা ইবন জুবাইরের সফরনামা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর দ্বিতীয় ভ্রমণ ছিল দুই বছরব্যাপী (১১৮৯–১১৯১ খ্রিষ্টাব্দ)– প্রাচ্যের অভিমুখে।

আর তৃতীয় ভ্রমণটিও ছিল পূর্বাঞ্চলে। এই ভ্রমণের নেপথ্যে প্রধান কারণ ছিল তাঁর সহধর্মিণী হারানোর বেদনা। তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলে ১১৮৫ সালে তাঁর সহধর্মিণী হারানোর বেদনা ভুলে যেতে প্রায় দশ বছরকাল স্পেনের বাইরে কাটান। এ সময় তিনি সিউটা থেকে বের হয়ে মক্কায় রওয়ানা দেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে বায়তুল মোকাদ্দাস ও কায়রো সফর করে সর্বশেষ আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই ১২১৪/১২২৭ সালে ২৯ ডিসেম্বর তারিখ বুধবার মৃত্যুবরণ করেন (আল-মাক্কারীযী, ১৯৯১ : ১৫২)। পরিতাপের বিষয় যে, তাঁর প্রথম সফরের বর্ণনা ছাড়া তিনি অন্য দুই সফরের কোনো বর্ণনা পরবর্তীদের জন্যে লিখে যাননি (ক্র্যাচকোভসকি, ১৯৬৩ : ২৯৯–৩০১)।

রীন্দ্রনাথ ও ইবন জুবাইরের ভ্রমণ পথ

রবীন্দ্রনাথ ১৮৭২ সাল থেকে ১৯৪১ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বহু দেশ-এলাকা সফর করেছেন। যেমন– রবীন্দ্রনাথ ১৯১২–১৩ খ্রিষ্টাব্দ জুড়ে এক বছর চার মাস ১২ দিন বিলেত-আমেরিকা-বিলেতে ঘোরেন। ফিরে এসে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরও পান। এরপর ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা মে তিনি আমেরিকা যাত্রার সুবাদে জাপানি জাহাজে যাত্রা শুরু করেন, এবারের যাত্রাসঙ্গী দুইজন ইংরেজ অ্যান্ড্রুজ ও পিয়ার্সন এবং কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল দে। এই সফরে তিনি ১১ মাস কাটান। *জাপানযাত্রী*তে স্বভাবতই জাপানি জাহাজে জাপান পর্যন্ত যাত্রা এবং জাপানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা উঠে এসেছে। এর সময়কাল ৩ মে ১৯১৬ থেকে চার মাস।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*-এর প্রথম পত্রে সমুদ্রপথে ভ্রমণের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন,

> বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা 'পুনা' স্টীমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিল। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চার দিকের লোকের কোলাহল সইতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। ...সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ। ২০শে থেকে ২৬শে পর্যন্ত যে করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। সমুদ্রপীড়া কাকে বলে অবিশ্যি জান কিন্তু কী রকম তা জান না (রবীন্দ্রনাথ, ২০১০ : খণ্ড ১, ৩৭)।

রবীন্দ্রনাথ পিনাঙ বন্দরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন–

> ২৯ বৈশাখ। বিকালের দিকে যখন পিনাঙের বন্দরে ঢুকেছি, আমাদের সঙ্গে যে-বালকটি এসেছে, তার নাম মুকুল, সে বলে উঠল, "ইস্কুলে একদিন পিনাঙ সিঙাপুর মুখস্থ করে মরেছি, এ সেই পিনাঙ।" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১০ : খণ্ড ২, ৩৩)।

পক্ষান্তরে, রুশ প্রাচ্যবিদ ইগ্‌ন্যাটি ক্র্যাচকোভসকি (Ignaty Yulianovich Krachkovsky) (১৮৮৩–১৯৫১) মনে করেন, ভূগোল সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করার পূর্বে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে খ্যাতি লাভ করা ইবন জুবাইরের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মূলত তাঁর এই ভ্রমণই তাঁকে বিশ্বের দরবারে পরিচয় করে দিয়েছে। তাঁর সফরনামায় উল্লেখকৃত সফরের

সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের বদৌলতে তাঁর ভ্রমণপথ সম্পর্কে পাঠকগণ ওয়াকিবহাল হতে পারে (ক্র্যাচকোভসকি, ১৯৬৩ : ২৯৯–৩০১)।

১১৮৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ইবন জুবাইর তাঁর বন্ধু আহ্মাদ ইবন হাস্সানসহ হজের উদ্দেশ্যে গ্রানাডা ত্যাগ করে আত্-ত্বারীফ (ট্রাফালগার) দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। প্রথমে সাগর পাড়ি দিয়ে সিউটা (Ceuta) নগরীতে চলে যান। অতঃপর ২৪ ফেব্রুয়ারি আলেকজান্দ্রিয়াগামী একটি তরীতে আরোহণ করেন। সে তরীতে সাগরের উত্তাল ঢেউ আঁছড়ে পড়ছিল এবং তাঁদেরকে স্পেন উপকূলের অদূরে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দানিয়া বন্দর, তারপর মেজর্কা (Majorca, or Mallorca), মেনর্কা (Minorca or Menorca), সার্দানিয়া (Sardinia) দীপপুঞ্জ, অতঃপর সিসিলি (Sicily) দ্বীপ হয়ে ক্রেট (Crete) দ্বীপ পৌঁছেন। অবশেষে ট্রাফালগার (Trafalgar) দ্বীপে পৌঁছে সেখান থেকে ৩০ দিন একটানা সফরের পর ২৬ মার্চ আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছেন। তারপর নীলনদ অতিক্রম করে কায়রো পৌঁছেন। সেখান থেকে লোহিত সাগরের উপর দিয়ে 'আইযাব বন্দর' (যা হাজিদের গমনাগমনের জন্য ব্যবহৃত হতো) পৌঁছেন। এরপর জিদ্দায় অবতরণ করে মক্কাগামী এক কাফেলায় শরিক হন। মক্কায় অর্ধবছর অবস্থান করে মদিনা হয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। এরপর বাগদাদ, সামরা (*Sāmarrā*), মুসেল, আলেপ্পো পরিদর্শন করে দামেশকে চলে যান। সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করেন। উল্লেখ্য, তৎকালীন সময়ে সিরিয়ার উপকূলীয় এলাকা ক্রুসেডারদের দখলে ছিল। এরপর উক্কা বন্দর হতে এক খ্রিষ্টান মালিকানার তরীতে আরোহণ করে সিসিলি পৌঁছেন। প্রায় দুই বছরের সফর শেষ করে ১১৮৫ সালের এপ্রিলে গ্রানাডায় পৌঁছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও ইবন জুবাইরের ভ্রমণসাহিত্যকর্ম

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য—

ক. *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*
খ. *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি*
গ. *জাপানযাত্রী*
ঘ. *যাত্রী* : ১. পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ২. জাভা-যাত্রীর পত্র
ঙ. *রাশিয়ার চিঠি*
চ. *পারস্যে*
ছ. *পথের সঞ্চয়*

এসব বইয়ের বাইরে *ছিন্নপত্রাবলী*সহ অসংখ্য চিঠিপত্রে তাঁর ভ্রমণের কথার উল্লেখ আছে। *জীবনস্মৃতি* ও *ছেলেবেলা*তেও তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। এককথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঘুরে বেড়িয়েছেন। ২০১০ সালে প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা থেকে আবুল মোমেনের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণসমগ্র দুই খণ্ডে বের হয়। এর নামকরণ করেন এভাবে, *রবীন্দ্র-ভ্রমণসাহিত্য, প্রথম খণ্ড : পাশ্চাত্য এবং রবীন্দ্র-ভ্রমণসাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড : প্রাচ্য*।

পক্ষান্তরে, ইবন জুবাইরের প্রথম সফরনামা "*তাযকিরাহ্ বিল আখবার আন্ ইত্তিফাক্বাত আল-আসফার*" নামক একটি গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এটি ১৪০৮ সালে বৈরূতের দার সাদির থেকে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি নুর-উদ-দীন ও সালাহ-উদ-দীনের নেতৃত্বে ক্রুসেডের বিরুদ্ধে

মুসলমানদের প্রতিরোধ সংগ্রামের বর্ণনা তুলে ধরেন। ধারণা করা হয়, এটি লিপিবদ্ধ হয়েছিল আনুমানিক ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে যা প্রাচ্য-প্রতিচ্যের সর্বত্র প্রচার লাভ করে। ঐতিহাসিক ও ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম রাইট (William Wright) এটি প্রকাশ করেন তাঁর "Early travelers in Palestine" নামক একটি গ্রন্থে, যেখানে ভিন্‌দেশি মুসলিম-খ্রিষ্টান-ইহুদি পর্যটক ও আরবের অনেক হাজির ভ্রমণকাহিনি স্থান পেয়েছে।

পর্যটনের প্রতি ইবন জুবাইরের ছিল বেশ আগ্রহ। তাই তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তিনবার প্রাচ্য সফর করেন। প্রথমবার ছিল ৫৭৮–৫৮১ হি.। তিনি তাঁর তিনটি ভ্রমণকাহিনির বর্ণনা দিয়ে একক কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। শুধুমাত্র প্রথম সফরের বর্ণনাই তাঁর উপর্যুক্ত সফরনামায় স্থান পেয়েছে।

কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, তাঁর সফরনামার গ্রন্থটি স্বরচিত নয়। বরং তিনি সেটির মূলভাব লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। পরে তাঁর কাছ থেকে এর সংগ্রহকারীগণ সে ভাবধারাকে সুবিন্যস্ত করে গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন।[৯] যাহোক তাঁর এই গ্রন্থটি ভ্রমণসাহিত্যে আরবদের অন্যতম রচনা হিসেবে পরিগণিত হয়।

ভ্রমণ সাহিত্যের শীর্ষে তাঁর নাম স্থান পেলেও আজ পর্যন্ত তাঁর সফরনামার একমাত্র পাণ্ডুলিপি (আনু. ৮৭৫ হি./১৪৭০ খ্রি.) যা লন্ডনে বিদ্যমান, তদ্ব্যতীত আর কোনো পাণ্ডুলিপি ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো শাখায় পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে তাঁর ভ্রমণের কথা ব্যাপকভাবে জানা যায় ডোজি (Dozy) ও আমারি (Amari)-এর আংশিক মুদ্রণের মধ্য দিয়ে। আরো পরে যখন বৃটেনের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ রাইট (William Wright) মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর সফরনামার পূর্ণ মুদ্রণ করেন। তখন পাঠক সমাজে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। রবার্টসন স্মিথ (Robertson Smith)ও এর সম্পাদনা করেন। অতঃপর ক্লিস্টিনো শাপরিলি (Celestino Schiaparelli) ১৯০৬ সালে ইতালি ভাষায় এর অনুবাদ করেন। এরপর ডি-জুই (De Geoje) ১৯০৭ সালে এর পরিমার্জিত সংস্করণ বের করেন। এরপর মিশরে ইউরোপীয় সংস্করণ বের হয়। অতঃপর ১৯৫৫ সালে মিশরে সর্বাধিক পরিমার্জিত সংস্করণ বের হয়। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে মরক্কোর ফেজ নগরীতে যে সকল পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তা পরিমার্জিত ছিল না। সম্প্রতি ইলেক্ট্রনিক বিশাল আরবি লাইব্রেরি *"আল-মাকতাবাহ্ আশ্-শামিলাহ্"* ভার্সন ৩.১৪ তার "কুতুবুল বুল্‌দান" ক্যাটাগরিতে এ সফরনামার সফ্‌ট কপি ডাটাবেজ প্রোগ্রামের সাহায্যে গ্রন্থাবদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও ইবন জুবাইরের সফরনামার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্যায়ন

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনিতে দৈনন্দিন ভ্রমণ-দর্শনের তথ্যের উপস্থিতি কম। দর্শনীয় স্থান আর স্মরণীয় ব্যক্তির বর্ণনার গুরুত্ব নেই। মূলত ভ্রমণকালীন ছোট্ট অভিজ্ঞতা যখন তাঁর মনে বড়ো কোনো উপলব্ধি ও ভাবনা সঞ্চারিত করেছে, তখনই তিনি লিখতে বসেছেন। ফলে এসব লেখায় একদিকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের রস ও প্রসাদ যেমন মেলে, অন্যদিকে দার্শনিক মনের সত্যান্বেষণের বিশ্লেষণ থেকে মননের খোরাক জোটে। তাঁর ভ্রমণের মধ্যে দর্শনীয় স্থান দেখার তাগাদা বেশি ছিল না। স্থানান্তরে গিয়ে নতুন পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে মন ভালো ও তাজা করার উপাদান পেতেন যেন। তাতে কবির আসল রসদ মিলে যেত লেখার প্রেরণা।

অন্যদিকে, ইবন জুবাইর ১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দে (৫৮১ হি.) প্রথম সফর হতে গ্রানাডায় প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর সফরের বর্ণনা ছিল ডায়েরি সদৃশ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে, যার কোনো সুনির্দিষ্ট সর্বজন পরিচিত শিরোনাম ছিল না। তবে ঐ গ্রন্থের দুই ধরনের শিরোনামের কথা জানা যায়। প্রথমটি *"ই'তিবার আল-নাসিক ফী যিক্র আল্-আছার্ আল-কারীমাহ্ ওয়া আল-মানাসিক।"* অপরটি *"তাযকীর বিল্-আখ্বার্ 'আন্ ইক্তিফাক্বাত আল আছার।"* একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শিরোনাম দুটি ইবন জুবাইর প্রদত্ত ছিল না। বরং 'কাশ্ফুয্যুনূন'[১০] গ্রন্থ প্রণেতা হাজি খলিফা ও রুশ প্রাচ্যবিদ ইগ্ন্যাটি ক্র্যাচকোভসকি মনে করেন, তাঁর 'কিনান' বংশের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে এর প্রচলিত শিরোনাম ছিল– *"রিহ্লা আল-কিনানী"*। একইভাবে উইলিয়াম রাইট ও হুসায়ন নাস্সার এর অধিকতর যুক্তিসংগত ও সুপরিচিত শিরোনাম ব্যবহার করেছেন– *"রিহ্লা ইবন জুবাইর"*। এ প্রসঙ্গে হুসায়ন নাসসার বলেন, "তবে আমি ঐ সকল নাম এই সফরনামার শিরোনাম হতে বাধ সাজে বলে মনে করছি না, কারণ এর খ্যাতি ও কদর বেড়ে এর নামগুলো যেন বাস্তবে এর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা এর লেখকের উপনামের মতো।" [রিহ্লা ইবন জুবাইর, (১৯৯২) : ৫]

তাঁর সুখ্যাতি প্রথম দিকে শুধুমাত্র পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে সর্বত্র বিশেষ করে ভ্রমণ সাহিত্য জগতে তাঁর খ্যাতির পেছনে মূল কাজ করে তাঁর এই সফরনামা। একারণেই পরবর্তীকালের অনেক ভূগোলবিশারদ ও ঐতিহাসিক কখনো তাঁর নামের প্রতি ইঙ্গিত করে, কখনো বা নিজেদের রচনায় তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়েছেন। পর্যটকদের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁরা তাঁর বক্তব্যের অবতারণা করেছেন তাঁরা হলেন– আল-'আব্দারী (মৃ. ১৩০০ খ্রি.), খালিদ ইবন 'ঈসা আল-বালাভী (আনু. ৭৩৪ হি./ ১৩৩৫ খ্রি.) এবং ইবন বতুতা। বিশুদ্ধ মতানুসারে ইবন বতুতাকে ইবন জুবাইরের বিশেষ বর্ণনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অনুরূপভাবে ঐতিহাসিকদের মধ্য থেকে যাঁরা তাঁর জ্ঞানগরিমার দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা হলেন– ঐতিহাসিক লিসানুদ্দীন আল-খাতীব, আল-মাক্বরীযী, আল-ফাসী ও আল-মাক্কারী। প্রত্যেকেই নিজের রচনাকর্মে তাঁর জীবনালোচনাসহ বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আরবি সাহিত্যের বিশেষ শাখা 'মাকামা' সাহিত্যের অন্যতম রচনাকর্ম "হারীরীর মাকামাত"-এর ব্যাখ্যাকার শারীসী (মৃ. ৬১৯ হি./১২২২ খ্রি.) হলেন ইবন জুবাইরের অন্যতম শাগরেদ, যিনি ওস্তাদের ভ্রমণের অনেক বিক্ষিপ্ত অংশ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইবন জুবাইর তাঁর ঐতিহাসিক সফরে প্রাচীন বিভিন্ন নিদর্শন, মসজিদ ও লোকসভা পরিদর্শন করেছেন এবং সেগুলো যে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তা তাঁর বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয়। সালাহ-উদ্-দীনের যুগে মিশরের অবস্থার বর্ণনার পাশাপাশি হাজিদের উপর আরোপিত কর প্রত্যাহার করার জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মসজিদে আকসা, দামেশকের সর্ববৃহৎ মসজিদ 'আল-জামি আল-উমাবী' ও তথায় সংরক্ষিত আজব ঘড়ির চিত্রায়ণ করেছেন। ঘড়িটি নির্মাণ করেছিলেন রিদওয়ান ইবন আস্-সা'আতী। তাছাড়া তিনি সমকালীন নানা অবস্থার পর্যালোচনাও করেছেন।

সিসিলি ও সেখানকার নিদর্শনাবলি যেমন– মসজিদ, শিক্ষাকেন্দ্র, বালাখানা ইত্যাদি তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্ববহ দৃশ্য। অনুরূপভাবে দ্বীপপুঞ্জে আরবদের রেখে যাওয়া সভ্যতার নিদর্শন তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। মোদ্দাকথা– ইবন জুবাইর তাঁর এই সফরনামার মাধ্যমে

হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বাঙ্গীন জীবনচিত্র আমাদের সমক্ষে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর ঘুরে আসা দেশ-নগর-বন্দর তাঁর মনে যে রেখাপাত করেছে তারই অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন এই সফরনামায়।

ইবন জুবাইরের সফরনামা সমকালীন যুগের জীবনচিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। মিশর ও সিরিয়ায় নুর-উদ্-দীন ও সালাহ-উদ্-দীনের নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তার চিত্র পাওয়া যায় ইবন জুবাইরের সফরনামায়।[১১] এক্ষেত্রে গভর্নর উসামা ইবন মুন্‌কিযের ডায়েরির সাথে এর মিল রয়েছে। যদিও-বা দুই লেখকের মাঝে উপস্থাপনা ও রচনার পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। ফাদার Lammens ইবন জুবাইরের সিরিয়ার বর্ণনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে, ইবন জুবাইর সত্যিকার অর্থে বাস্তবধর্মী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাধর। সিসিলি দ্বীপের মুসলিম সমাজের জীবনালেখ্য রূপায়ণে তাঁর সফরনামার অনন্য ভূমিকা রয়েছে। কারণ, গ্রানাডায় তাঁর প্রত্যাবর্তনকালে ১১৮৪ সালের ডিসেম্বরে সিসিলির উত্তর উপকূলবর্তী অঞ্চলে মেসিনা (Messina) হতে ট্র্যাপানি (Trapani) অতিক্রম করেছেন। সেখানে ১১৮৫ সাল পর্যন্ত অবস্থান করে সেখানকার মুসলিম জনপদের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যাবলি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। তাঁর বর্ণনায় সিসিলির মধ্যযুগীয় নিদর্শনের বর্ণনা ছাড়াও নরমান্দগণের (Normands) প্রাসাদের কথাও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও তাঁদের প্রাসাদের বর্ণনা দিয়েছেন আধুনিক অনেক ল্যাটিন গ্রন্থাকার।

ইবন জুবাইর 'আব্‌হুর' বন্দরের কাছে হেজাযের উপকূলে পৌঁছার ঘটনা বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

> আমরা 'আব্‌হুর' নামক এক জেটিতে নোঙ্গর করলাম। জিদ্দা থেকে তার দূরত্ব একদিনেরও কম। সেটি ছিল অবস্থানগত দিক থেকে চমৎকার একটি জেটি। কারণ, সাগরের একটি উপ-অংশ স্থলপথের দিকে গেছে। স্থলপথটি সাগরের দু প্রান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং মাঝিমাল্লারা তার স্থিতিশীলতার সুবাদে শান্তভাবে জাহাজ নোঙ্গর করতে পারে। পরবর্তী সোমবার ভোরে মহান আল্লাহর ফজলে আমরা (সাগর পথে) সেখান থেকে শীতল বায়ু উপেক্ষা করে যাত্রারম্ভ করলাম। আল্লাহ (যাত্রাপথ) সুগমকারী, তিনি ছাড়া নেই কোনো পালনকর্তা। যখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসল আমরা জিদ্দার নিকটবর্তী স্থানে নোঙ্গর করলাম। জিদ্দা (সেখান থেকে) আমাদের এক চোখের পথ। পরের দিন মঙ্গলবার ঊষালগ্নে প্রবল বাতাস আমাদেরকে জেটিতে ভিড়তে বাধা দিল। এই জেটিতে প্রবেশ করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল– ঘন গাছগাছালি ও ডালপালার কারণে।[১২]

শৈল্পিক দিক থেকে ইবন জুবাইরের সফরনামা আরবি ভ্রমণ সাহিত্যের উঁচু রচনাশৈলী সমৃদ্ধ। যদিও-বা আপাতদৃষ্টে তার দীর্ঘ বর্ণনাধারা সাধারণ পাঠকের কাছে বিরক্তিকর বটে, বাস্তবে তার রচনারীতি অনেকাংশে প্রাণবন্ত ও সহজভাবে উপস্থাপিত। উদাহরণস্বরূপ আলেকজান্দ্রিয়ার আমদানি-রপ্তানি শুল্ক কিংবা সিসিলির উপকূলে ভ্রমণতরীর দুর্যোগের বিবরণের কথা উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিকভাবে তাঁর উপস্থাপনার লক্ষ্যবস্তু হলো– শিল্পদক্ষতা ও চমৎকারিত্ব। অধিকন্তু তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনে ছন্দোবদ্ধ ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। তবে, তা অতিমাত্রায় নয় কিংবা পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য নয়। অনুরূপভাবে তাঁর লেখা সাহিত্যিক উদ্ধৃতি ও অনুপম ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যে ভরপুর, যার সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা পাঠকের থাকলে তার পক্ষে তাঁর বক্তব্য

বুঝে ওঠা সম্ভব। মোদ্দাকথা, তাঁর সফরনামা অতি উঁচুমানের রচনা– যার মাধ্যমে সে যুগের একদল স্পেনীয় ভূগোলবিশারদের কৃতিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলা যায়।[১৩]

সমালোচকদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ও ইবন জুবাইরের ভ্রমণসাহিত্য

রবীন্দ্র ভ্রমণসাহিত্য সমালোচক আবুল মোমেন লিখেছেন,

> ভ্রমণসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী এক স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে। তাঁর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোনো লেখকেরই ভ্রমণের এত ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতা নেই, ভ্রমণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের এত বইও নেই। সৃষ্টির অন্যান্য শাখার মতো এখানেও রবীন্দ্রনাথ কেবল অনন্য নন, এক বিস্ময়। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১০ : খণ্ড ১, ভূমিকা-১)

ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট সমালোচক আব্দুল কুদ্দুস আল-আন্সারী প্রাচ্য-প্রতীচ্যের তথ্যপঞ্জি ও প্রাচ্যবিদগণের দশ গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ইবন জুবাইরের জীবনী লিখার সূচনালগ্নে মন্তব্য করেছেন এভাবে,

> এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই, কারণ ইবন জুবাইর নিঃসন্দেহে আরব পরিব্রাজকগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রশস্ত চিন্তার অধিকারী, সমন্বিত পর্যবেক্ষক, রচনারীতিতে সিদ্ধহস্ত, স্বচ্ছ ভাব প্রকাশক, সাদামাটা বর্ণনাকুশল, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে সুচতুর, সমকালীন যুগের সার্বিক মুসলিম রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে সচেতন ও এর নিবিড় পর্যবেক্ষক এবং সিদ্ধান্তবাগীশ।[১৪]

ভ্রমণ সাহিত্যের আধুনিক সমালোচক আহ্মাদ রামাদান আহ্মাদ বলেছেন,

> নিঃসন্দেহে ইবন জুবাইর ছিলেন ভ্রমণ সাহিত্যের পথিকৃৎ, বিশেষ করে পশ্চিমা পরিব্রাজকগণের মাঝে। তাঁর উত্তরসূরি অনেক পর্যটক ও ঐতিহাসিক তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু সংগ্রহ করেছেন। যার বড়ো প্রমাণ হলো– পূর্বাপর অসংখ্য ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ তাঁর জীবনী লেখার কাজে ও তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রচার-প্রসারের ভূমিকায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।[১৫]

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, 'ট্রাভেল লিটারেচার' বা 'ভ্রমণসাহিত্য' মূল সাহিত্য অঙ্গনে এক নতুন সংযোজন। কালক্রমে এর কদর অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলা ও আরবি ভাষার পাঠক সমাজেও বাড়তে থাকে। এই ভ্রমণসাহিত্যের আরব কিংবদন্তী হলেন স্পেনের ইবন জুবাইর। তাঁর কিছুকাল পরে এহেন ভ্রমণ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন মার্কো পোলো (১২৫৪ খ্রি.–১৩২৪ খ্রি.)। তাঁরও পরে ইবনে বতুতা (১৩০৪ খ্রি.–১৩৭৭ খ্রি.) যিনি মার্কো পোলোর চেয়েও বেশি পথ সফর করেছেন এবং শ্রেষ্ঠ মুসলিম পর্যটক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়। তাঁর লেখায় একদিকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের রস ও প্রসাদ যেমন মেলে, অন্যদিকে দার্শনিক মনের সত্যান্বেষণের বিশ্লেষণ থেকে মননের খোরাক জোটে। রবীন্দ্রনাথের কালে এবং পরেও পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্যিকদের অবদানে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের সমৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

টীকা

১. 'ভ্রমণ সাহিত্য ও প্রকৃতি' ,accessed on 05.09.2012, URL: http://clickforboi.in/book/ভ্রমণ সাহিত্য ও প্রকৃতি/

২. আরবি 'তুহফা' শব্দের অর্থ– gift, present, gen, work of art। বহুবচনে 'তুহফ' ব্যবহৃত হয়। (Hans Wehr, ১৯৬০ : ৯২)।

৩. 'আন্-নুয্যার' শব্দটি আন্-নাযির শব্দের বহুবচন। অর্থ-দায়িত্বশীল ব্যক্তি, মন্ত্রী অর্থেও শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় (ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, তা. বি. : ৯৩২)।

৪. তাঁর পুরো বংশতালিকা হলো– "মুহাম্মদ ইবন আহ্মাদ ইবন জুবাইর ইবন মুহাম্মাদ ইবন জুবাইর ইবন সা'ঈদ ইবন জুবাইর ইবন সা'ঈদ ইবন জুবাইর ইবন সা'ঈদ ইবন জুবাইর ইবন মুহাম্মাদ ইবন মারওয়ান ইবন আব্দুস্সালাম ইবন মারওয়ান ইবন আব্দুস্সালাম ইবন জুবাইর।" (আল-মাক্কারীযী, ১৯৯১ : ১৫২।)

৫. ভালেন্সিয়া (Valencia) হলো- ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত স্পেনের পূর্বাঞ্চলের ভালেন্সিয়া প্রদেশের রাজধানী।

৬. ইবন আয্-যক্কাক আল-বালান্সী (৪৯০–৫২৮ হি.) হলেন 'আলী ইবন 'আতিয়্যাহ্ ইবন মুতার্‌রাফ আবুল হাসান আল-লাখ্মী আল-বালান্সী ইবন আয্-যক্কাক আল-বালান্সী, যিনি স্পেনের প্রসিদ্ধ কবি ইবন খাফাজার (Ibn Khafaja) (১০৮৫–১১৩৭ খ্রি.) ভাগ্নে ছিলেন। তিনি সূক্ষ্ম প্রেমমূলক ও প্রশংসামূলক কাব্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৪০ বছরেরও কম সময় বেঁচেছিলেন। কবি ইবন আয্-যক্কাক এই ভালেন্সিয়া সম্পর্কে বলেছেন : "ভালেন্সিয়া শহর সম্পর্কে যখন তুমি ভাবতে থাকবে তখন তার নিদর্শন হিসেবে তুমি দেখতে পাবে যে, সেটি সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী শহর। আমার দৃষ্টিতে তার স্বপক্ষে তারই বড়ো দলিল হলো– তার সৌন্দর্য চোখের সামনেই স্পষ্টত দৃশ্যমান। পালনকর্তা যেন তাকে রেশমি কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন, তার রয়েছে দুটো নিদর্শন– সাগর আর উপত্যকা" (ইবন আয-যাক্কাক, ১৯৬৪ : ১৩৯; আল-মাক্কারী, ১৯৬৮ : ১৮০)। "Ibn_al-Zaqqaq" Wikipedia, the free encyclopedia, URL: http://en.wikipedia.org/ wiki/Ibn_al-Zaqqaq, accessed on 1 January 2014.

৭. বাল্জ ইবন বিশ্র ইবন 'আয়ায আল-কুশায়রী দামেশকের একজন বিখ্যাত অশ্বারোহী বীর, যিনি গভর্নর যুগে [Wulat (Governors) Period– ৯৫ হি.–১৩৮ হি./১৭৪ খ্রি.–৭৫৬ খ্রি.] স্পেনের গভর্নর ছিলেন।

৮. স্পেনের ভালেন্সিয়া রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত প্রাচীন শহর হলো শায়তুভা বা বায়তুভা (Xàtiva)।

৯. 'ঢ়ইবুজ নবই "URL: http://ar.lib.eshia.ir/40449/1/119, accessed on 1 January 2014.

১০. হাজী খালীফাহ্, (তা. বি.) : ৮৩৬।

১১. সালাহ-উদ্-দীন বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয় করলে তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে ইবন জুবাইর তাঁর এক কবিতায় বলেন,

ক. তুমি সঠিক ধর্ম রক্ষার্থে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ, কারণ প্রতিশোধগ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ তোমাকেই বাছাই করেছেন।

খ. স্রষ্টার (ধর্মের) সহযোগিতায় তুমি উদ্যোগ নিয়েছ, তাইতো তিনি তোমাকে 'সাহায্যকারী রাজা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ. বায়তুল মোকাদ্দাসকে জেরুজালেমের বুকে জয় করেছ, সুতরাং উহা তার স্বীয় পবিত্র গুণে স্বস্থানেই ফিরে এসেছে।

ঘ. তুমি সেখানে সৎপথের মিনারকে সমুন্নত করেছ, এবং তুমি তার বিলুপ্ত চিহ্ন থেকে পুনর্জীবন দান করেছ।

১২. (*"রিহ্লা ইবন জুবাইর"*, ১৯৯২ : ৫১)। হুসায়ন নাস্সার 'আব্হুর' নামটি সম্পর্কে মোটেও অবহিত নন। তাঁর মতে শব্দটি বিকৃত। আসলে জিদ্দার উত্তরেই 'আব্হুর'-এর অবস্থান। এটি বর্তমানে জিদ্দার উপকূলীয় গুরুত্বপূর্ণ শহরতলি। (ড. আহ্মাদ, তা. বি. : ৩২৪)

১৩. ক্র্যাচকোভসকি (Krachkovsky), ১৯৬৩ : ৩০০–৩০১।

১৪. আব্দুল কুদ্দুস আল-আন্সারী, (তা. বি.) : ১৬।

১৫. ড. আহ্মাদ, (তা. বি.) : ৩২৪।

সহায়কপঞ্জি

আত্-তুজায়বী (১৯৭৫)। *মুসতাফাদ আর্-রিহ্লাহ্ ওয়া আল্-ইগতিরাব*। সম্পাদক : আব্দুল হাফিয মান্সুর। আল-দার্ আল-আরাবিয়্যাহ্ লিল্-কুত্তাব, কায়রো।

আনওয়ার আব্দুল আলীম (১৯৭৮)। *আল-মাল্লাহাঃ ওয়া 'উলূমুল বিহার 'ইন্দাল্ 'আরাব*। 'আলাম আল-মা'রিফাহ্, কুয়েত।

আফিফা মাহ্মুদ দায়রানী (১৯৬৪)। *ইবনুয্যাক্কাক আল-বালেন্সি*। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, আরবি বিভাগ, আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়, বৈরূত।

আব্দুর রহ্মান হামীদাহ্ (১৯৯৫)। *আ'লাম আল-জুগ্রাফিইয়ীন আল-'আরাব ওয়া মুক্বতাতাফাত মিন্ আছারিহিম্*। দার আল-ফিক্র, দামেশক।

আব্দুল কুদ্দুস আল-আন্সারী (তা. বি.)। *মা'আ ইবন জুবাইর ফি রিহ্লাতিহি*। ———।

আয্-যিরিক্লী (২০০২)। *আল-আ'লাম*। দার আল-ইল্ম লিল্-মালায়ীন, বৈরূত।

আল-মাক্কারী (১৯৬৮)। *নাফ্হু আত্-ত্বীব মিন্ গুস্ন আল-আন্দালুস আর্-রাত্বীব*। সম্পাদক : ইহ্সান 'আব্বাস। দার সাদির, বৈরূত।

আল-মাক্বরীযী (১৯৯১)। *আল-মুক্বাফ্ফা আল-কাবীর*, ৫ম খণ্ড। সম্পাদক : মুহাম্মাদ আল-ইয়া'লাবী। দার আল-গার্ব আল-ইসলামী, বৈরূত।

আল-মুর্সী আদ্-দাব্বী (১৯৮৯), *বুগ্য়াহ্ আল-মুল্তামিস্ ফী তারীখ রিজাল আহ্ল আল্-আন্দালুস*। সম্পাদক : ইব্রাহীম আল-আবয়ারী। দার আল-কিতাব আল-মিসারী-দার আল-কিতাব আল-লুবনানী, বৈরূত।

আহ্মাদ বাদ্র (১৯৭২)। *দিরাসাত ফি তারিখ আল-আন্দালুস ওয়া হাদারাতুহা মিন্ আল-ফাত্হ হাত্তা আল-খিলাফাহ্*। দামেশক।

আহ্মাদ রামাদান আহ্মাদ (তা.বি.)। *আর্-রিহ্লাহ্ ওয়া আর-রাহ্হালাহ্ আল-মুসলিমূন*। দারুল বায়ান আল-'আরাবী, জিদ্দা।

ইগন্যাটি ক্র্যাচকোভসকি (১৯৬৩)। *তারিখ আল-আদব আল-জুগ্রাফি আল-আরবি*। অনুবাদক : সালাহুদ্দীন হাশিম। মাতবা'আহ্ লাজ্নাহ্ আত্-তালীফ ওয়া আত্-তারজামাহ্ ওয়া আন্-নাশ্র, কায়রো।

ইবন আয-যাক্কাক আল-বালান্সি (১৯৬৪)। *দিওয়ান*। সম্পাদক : 'আফিফা মাহমুদ দায়ারানি। দার আস-সাক্বাফাহ্, বৈরূত।

ইবন জুবাইর (১৯০৭)। *রিহ্লা ইবন জুবাইর*। সম্পাদক : উইলিয়াম রাইট। ব্রেইল প্রেস (*Braille Press*), লাইডেন।

ইবন জুবাইর (তা.বি.)। *রিহ্লা ইবন জুবাইর*। দার সাদির, বৈরূত।

ইবনে বতুতা (১৯৬৮)। *ইবনে বতুতার সফরনামা*। অনুবাদক : মোহাম্মদ নাসির আলী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য (তা. বি.)। *আল্-মু'জামুল ওয়াসীত*। কুতুবখানা হোসাইনিয়া, দেউবন্দ।

উমার রিদা কাহ্হালাহ্ (১৯৯৩)। *মু'জাম আল-মু'আল্লিফীন* ৩য় খণ্ড। মু'আস্সাসাহ্ আর্-রিসালাহ্, বৈরূত।

কার্ল ব্রকেলম্যান (তা.বি)। *তারিখ আল-আদাব আল-'আরাবী* ৩য় খণ্ড। দার আল-মা'আরিফ, কায়রো।

জুরজী যায়দান (১৯৯৬)। *তারিখ আদাব আল্-লুগাহ্ আল-'আরাবিয়্যাহ্* ৩য় খণ্ড। দার আল-ফিক্র, বৈরূত।

ফুয়াদ সায্কীন (১৯৯১)। *তারিখ আত্-তুরাছ আল-'আরাবি*। জামি'আহ্ আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সু'উদ আল-ইসলামিয়্যাহ্, রিয়াদ।

বাদ্রিয়্যাহ্ বিন্ত 'আলী ইবন জাম্'আহ্ আশ-শু'আইবী (২০০৬)। *'আসরুল-ওলাত্ ফি আল-আন্দালুস (৯৫ হি.-১৩৮ হি./ ৭১৪ খ্রি.-৭৫৬ খ্রি.) দিরাসাহ্ সিয়াসিয়্যাহ্ ওয়া হাদারিয়্যাহ্*। একটি মাস্টার্স অভিসন্দর্ভ, কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, সুলতান কাবুস বিশ্ববিদ্যালয়, ওমান।

বিলাল সালিম আল-হারূত্ব (২০০৮)। *সূরাতুল আখির ফি আদাব আর্-রিহ্লাত আল-'আন্দালুসিয়্যাহ্*। পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, মুতাঃ বিশ্ববিদ্যালয়, জর্ডান।

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইনান (১৯৬৯)। *তারিখ আল-আন্দালুস মিন্ আল-ফাত্হ ইলা বিদায়াহ্ 'আহ্দ আন্-নাসির*। কায়রো।

মুহাম্মাদ ইবন ফাতূহ্ আল-হুমাইদী (১৩৭১ হি.)। *জায্ওয়াহ্ আল-মুক্তাবাস ফি যিক্র ওলাত আল-আন্দালুস*। কায়রো।

যকী মুহাম্মাদ হাসান (১৯৮১)। *আর্-রাহ্হালাহ্ আল-মুস্লিমূন ফী আল-'উসূর আল-উস্ত্বা*। দার আর্-রা'য়িদ আল-'আরাবি, বৈরূত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১০)। *রবীন্দ্র-ভ্রমণসাহিত্য সমগ্র* (প্রথম খণ্ড : পাশ্চাত্য)। সম্পাদক : আবুল মোমেন। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১০)। *রবীন্দ্র-ভ্রমণসাহিত্য সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড : প্রাচ্য)। সম্পাদক : আবুল মোমেন। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

লিসানুদ্দীন ইবন আল-খাতীব (১৯৭৪)। *আল-ইহাতাহ্ ফি আখবারি গার্নাতাহ্* ২য় খণ্ড। সম্পাদক : মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ 'ইনান। মাকতাবাহ আল-খান্জী, কায়রো।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (২০১৩)। *ভ্রমণ সমগ্র*। পত্র ভারতী, কলকাতা।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (২০১৩)। *ভ্রমণ সমগ্র*। পত্র ভারতী, কলকাতা।

হাজী খালীফাহ্, (তা. বি.)। *কাশ্ফুয্যুনূন 'আন্ আসামিল্ ফুনূন* ১ম খণ্ড। দার্ ইহ্য়া' আত্-তুরাছ্ আল-'আরাবী, বৈরূত।

হাস্নী মাহ্মূদ হুসায়ন (১৯৮৩)। *আদব আর্-রিহ্লাহ্ 'ইন্দাল-'আরব*। দার্ আল-আন্দালুস, বৈরূত।

হুমায়ূন আহমেদ (২০১৩)। *ভ্রমণসমগ্র*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

হুসায়ন নাস্সার *সম্পা.* (১৯৯২)। *রিহ্লা ইবন জুবাইর*। মাকতাবাহ্ মিসর, জিদ্দাহ।

Hans Wehr (1960). *A Dictionary Modern Written Arabic Arabic-English*. (ed) J. Milton Cowan, New York.